দুর্নীতিগ্রস্ত নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে

জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু করতে হবে

ভোট ডাকাতির সংসদ বাতিলের দাবিতে ঢাকায় বাম জোটের মতবিনিময়সভায় নেতৃবৃন্দ

২৮ জানুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে 'নজিরবিহীন ভোট ডাকাতির নির্বাচন : গণশুনানীর অভিজ্ঞতা, নাগরিক সমাজের ভাবনা ও করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জোটের সমন্বয়ক ও সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন, ড. শাহদীন মালিক, অধ্যাপক এম এম আকাশ, অধ্যাপক আহমেদ কামাল, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, সুজনের সমন্বয়কারী দিলীপ সরকার, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। সভায় বাম জোটের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, বাসদ (মার্কসবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা মোমিনুল ইসলাম মোমিন প্রমুখ। মতবিনিময় সভা সঞ্চালনা করেন বাসদ নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজ। একাদশ জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বাম জোটের উপস্থিত প্রার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, জোনায়েদ সাকি, জলি তালুকদার ও শম্পা বসু।

ড. শাহদীন মালিক বলেন, পৃথিবীর ১৯৫টি দেশের মধ্যে ৬০টা দেশে গত ২০-৩০ বছর ধরে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। এই দেশগুলোর গণতন্ত্রও প্রশ্নবিদ্ধ। বাকি দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতার বদল হয় না, আমাদের দেশও এখন তাদের কাতারে যোগদান করেছে।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি। একটু মনে করে দেখুনতো তিনি কোন্ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন? তিনি নির্বাচনের মধ্যদিয়ে নয় একটি বিল পাশ হওয়ার দ্বারা রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স এসোসিয়েশান, সাংবাদিকদের ইউনিয়ন ও আইনজীবীদের বারগুলো এই তিনটা জায়গা ছাড়া অন্য জায়গাগুলো থেকে নির্বাচন উঠে গেছে। সুষ্ঠু নির্বাচন এখন কোথায় আছে? সুষ্ঠু নির্বাচন আছে কমিশনের বক্তৃতা ও তাদের কাগজ কলমে। এখন প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষক ও আওয়ামী লীগের কর্মী-নেতা সব মিলিয়ে ১৫ থেকে ১৮ লাখ লোক নির্বাচনের কারচুপিতে জড়িত হয়ে গিয়েছে। এই সংসদে টিভি চ্যানেলের মালিক ৪ জন মন্ত্রী, এডিটরদের ৭ জন এমপি হয়েছেন। যার জন্য জনগণের সংগ্রামের বিজয়কে কঠিন করে তুলবে। ফলে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে আমাদের এগুতে হবে। জগণের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হবে এরকম এক দুইটা

দাবি ধরে তার পক্ষে মিটিং-মিছিল করে একটা জায়গা বের করতে হবে। যেমন : ইতিমধ্যে বাম জোটের উত্থাপিত সংসদ নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আমরা চাই।

অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসানের জন্য আন্দোলনের শক্তির জনসমর্থন প্রয়োজন। আওয়ামী লীগের বাইরে এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যরাও গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলনে আছে। আগামী দিনে বাম গণতান্ত্রিক জোট সমমতে এগুতে পারবেন কীনা তার ওপর নির্ভর করবে গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলন কতদূর এগুবে। বামপন্থিরা যে আন্দোলনগুলো অতীতে করে এসেছে তা অব্যাহত রাখতে হবে। কোন বুর্জোয়া দল যদি মৌলবাদী শক্তির সাথে আপষ করে তার সাথেও কোন ঐক্য হতে পারে না। বামপন্থিদেরই আগামী দিনে প্রধান বিরোধী দল হতে হবে। একটা মৌলবাদী শক্তির উত্থানের জমি সমাজের নিচের অংশে আছে। বুর্জোয়ারা সেই শক্তিকে মোকাবিলা করবে না। শেখ হাসিনা হেফাজতের সঙ্গে আপষ করে কওমি জননী হয়েছে। আগামী দিনে একটা লিবারেল ডেমোক্রেটিক শক্তির উত্থান হবে। আপনারা রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে আগামী দিনে আপনারা এগুতে পারবেন।

অধ্যাপক আহমেদ কামাল বলেন, আমরা প্রথম নির্বাচন করেছিলাম ১৯৫৪ সালে। তখন মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় ছিল। সে নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন একজন ছাত্র নেতার কাছে হেরেছিলেন। তখন তারা নির্বাচনে কারচুপি, ভোট দখল-লুট সবই করতে পারতেন কিন্তু করেনি। করলে তাদের এই পরাজয় হতো না। করেননি, কারণ এই শিক্ষা তাদের ছিলো না। তখন পুরা রাষ্ট্রযন্ত্র মুসলিম লীগারদের হাতে এবং পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে উজ্জিবীত। তখন তাদের ট্রেনিং ছিল একটা পার্লামেন্টারি সরকার কায়েম করতে হবে, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আনতে হবে। এর পর আইয়ুব খান মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কয়েম করলেন এবং মৌলিক গণতন্ত্রীদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে নির্বাচন প্রক্রিটাকেই দুর্নীগ্রস্ত করে ফেললেন। তখনই আমরা নির্বাচনে দুর্নীতির সাথে পরিচিত হলাম। পাকিস্তানের এই শিক্ষাটাকে আমরা ভালো করে মনে রেখেছি। এই শিক্ষাটাকেই আমরা সাফল্যের সাথে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। পাকিস্তানি শিক্ষাটা '৭৩-এ সফল প্রয়োগ হলো। তার পর আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। কিছু দিন পরে দেখা গেলো সে সরকারের মধ্যেও ভূত ঢুকে গেছে। বলা হলো—না, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হবে। যে প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় থাকা যায় তাকে বিকশিত করা। মূলবিষয়টা দাঁড়ালো আমরা দেওয়ার জন্য শিক্ষিত হচ্ছি না। আজকে যেটা দাঁড়ালো, সরকারি দল ভোট নেবার নিরঙ্কুশ অধিকার নিয়ে নিয়েছে, আমাদের দেবার অধিকার আর নাই। এই হচ্ছে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আমাদের অর্জন। মানুষ সমাজকে ধীরে ধীরে উন্নত করে আমরা পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। এগুলো থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিতে না পারি তা হলে এগুলো নিয়ে আলোচনা করে লাভ কী?

আমরা এখন আর একটা জাতি রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে বাস করি না। কারণ জাতি রাষ্ট্র তার উন্নয়নের জন্য কিছু করতে চাইলে করতে পারে। আমরা এখন গ্লোবাল ক্যাপিটালিজমের যুগে আছি। আমাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত ও নজরদারিতে আছে। এখন আমেরিকা, ইংল্যান্ডেও গণতন্ত্র নাই। গণতন্ত্রের মুখোশ আছে, ভুয়া গল্প চলছে। ট্রাম্পের মতো কিছু জোকার সামনে আছে, আসল খেলোয়াড়রা পিছনে আছে। এখন একটা ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করা হচ্ছে আর এর মধ্যে মানুষকে আটকে ফেলা হচ্ছে। আমরা অনেক কিছু পরামর্শ দিতে পারি কিন্তু করবেটা কে? এটা মূলপ্রশ্ন। আমরা যাদের জন্য আলোচনা করছি সে মানুষগুলো কোথায়? যে মানুষ ভোট দিতে পারেনি, যাদের ওপর ভরসা করে এগুবো তারা তো এখানে নেই। রাস্তার রিক্সাওয়ালা, চা দোকানদার কী করলে সে ভোট দিতে পারবে সেটা তাকে জানাতে হবে। যাদের জন্য আমাদের পরামর্শ তাদের একথাগুলো শুনাতে পারলে লাভ হবে। আমরা যে জনগণের বন্ধু সে পরিচয় তাদের দিতে হবে। আমাদের নির্বাচনে জেতার জন্য কৌশল করতে হবে। আমাদের যে কর্মী বাহিনী আছে তাদের কর্মক্ষমতা ও কৌশল বাড়াবার শিক্ষা দিতে হবে। আমরা যেন জনগণের ভাতের, কাজের-শিক্ষার, চিকিৎসার দাবি না ছাড়ি। যারা ১৫৩টি আসনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতলো তাদের আমরা পাঁচ বছর ক্ষমতায় রাখলাম কেন? ক্ষমতাসীনরা দেখেছে এভাবে নির্বাচিত হয়েও ক্ষমতায় থাকা যায় তা হলে পরবর্তীতে তারা কেন একইভাবে আসতে চাইবে না? তারা আগেরবার ১৫৩টা নিয়েছে এবার ৩০০ আসন একইভাবে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কী করতে হবে সেটা রাজনীতিকদেরই ঠিক করতে হবে। আমি শুধু বলতে পারি আমরা যেন গণমানুষের কাছে যাই।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, আমাদের দেশে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে তার কোনটা অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, চোরাই টাকা, সাম্প্রদায়িকতা, পেশিশক্তি, প্রশাসনিক প্রভাব এগুলোকে যারা কাজে লাগাতে পারে তারা তো একটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন পার্থক্য আছে। তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে অন্তত সরকারি প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় ভোট হয়নি। এই হলো পার্থক্য। ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচন বাংলাদেশে সবদিক থেকে একটা অভূতপূর্ব নির্বাচন। বাংলাদেশের মানুষকে এটা দীর্ঘকাল মনে রাখতে হবে। এনির্বাচনে তারা অবিশ্বাস্য রকমের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এতগুলো প্রতিষ্ঠানকে একটা নির্দিষ্ট পথে সমন্বিতভাবে পরিচালনা করতে পারা অকল্পনীয় দক্ষতা। আনসার-পুলিশ, বিজিবি, প্রশাসন, পোলিং-প্রিজাইডিং অফিসার, রাজনৈতিক দলের এতগুলো শাখার মধ্যে যে সমন্বয় তৈরি হলো তা অভূতপূর্ব।

যেমন, রাত ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সিল মারতে হবে, দিনে কিছু সময় ভোট বন্ধ রাখতে হবে, ভোটাররা লাইনে দাঁড়াবে কিন্তু লাইন এগুবে না, রাতে মারা ব্যালট বক্সে ঢুকাতে হবে, দিনের বাড়তি ব্যালট সরাতে হবে এর জন্য একটা নিপুণ পরিকল্পনা করতে হয়েছে। টেলিভিশনের ক্যামেরা, পত্রিকার সাংবাদিক, দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। সবাইকে বোকা বানাতে পারা। ভোটারের চেয়ে ভোট বেশি হওয়াতে তারা একটু অস্বস্তিতে পড়েছেন। এই সফলতা দেখাতে পারার কারণে দেশে-বিদেশে তারা একদল সমর্থকগোষ্ঠী পেয়ে গেছে। ব্যাংক মালিকদের সমিতি, গার্মেন্টস মালিকদের সমিতি, বৃহৎ ব্যবসায়ী মালিকদের সমিতির লোকজন সবাই খুশি। বিদেশিরা মনে করে কে সরকারে আসলো কে গেল তার চেয়ে বড় কথা কার দ্বারা তাদের বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থ রক্ষা হবে। যেমন ভেনেজুয়েলার একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে বাদ দিয়ে তারা একজনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে যে নির্বাচিত না। ইউরোপীয় ইউনিয়নও একই কথা বলছে। কারণ মাদুরো তাদের স্বার্থের পক্ষে নয়। তথাকথিত গণতান্ত্রিক বিশ্ব একটা অগণতন্ত্রের পক্ষ নিল। নরেন্দ্র মোদি ভারতের ব্যবসায়িদের কাছে জনপ্রিয় কারণ সে ব্যবসায়িদের স্বার্থ দেখছে, আন্তর্জাতিক পুঁজিরও স্বার্থ দেখছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃতিত্বটা হচ্ছে, সে দৃঢ়তার সাথে আন্তর্জাতিক পুঁজিকে নিরাপত্তা দিচ্ছে, তার স্বার্থ রক্ষা করছে এবং এর জন্য যা যা দরকার সবই দেওয়া হবে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছে। দেশের জনগণের ভোটের অধিকার, গণতন্ত্র, পরিবেশ, নিরাপত্তা এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। শেখ হাসিনা সম্পর্কে তার দলের লোকেরা বলছে সে যা বলে তা করে। এটা আংশিক সত্য। যেমন তিনি দৃঢ়তার সাথে সুন্দরবন ধ্বংস করে, দেশ বিরোধী হলেও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করেন ১০০ টাকার কাজ ৫০০ টাকায় অনুমোদন দিচ্ছেন, তার দলের শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী, খুনিদের রক্ষা করে যাচ্ছেন। তিনি বলছেন নদী-খাল-বিল, বন যারা ধ্বংস করছে তাদের ক্ষমা নেই কিন্তু তাদের ক্ষমা করে দিচ্ছেন। নিরাপদ সড়কের আন্দোলন যখন ব্যাপক মাত্রা নিল তখন তিনি পাঁচ দফা নির্দেশনামা দিলেন এর একটাও মানা হয়নি। এব্যাপারে কোন দৃঢ়তা দেখা যায়নি। বদির মাদক ব্যবসা পুনর্বিন্যাস হচ্ছে, দুর্নীতি দমন করার কথা ছিলো তা হয়নি এসব ক্ষেত্রে তিনি দৃঢ় নন। বামপন্থী একদল বুদ্ধিজীবী তারা এখন সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাদের আস্থা এবং বিশ্বাস তৈরি হলো এটা আওয়ামী লীগের বড় প্রাপ্তি। ব্যাংক দুর্নীতির শিরোমনি সালমান রহমানকে তার উপদেষ্টা বানানো হলো; তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত সে তওফিক এলাহী আবারও উপদেষ্টা হলো—এগুলোতেও তাদের আস্থা কমে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ লুটের কেলেঙ্কারির তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই। ফিলিপাইনের সিনেটে এই বিষয় নিয়ে শুনানি হলো, একজন অপরাধীর ৪০ বছর জেল হলো অথচ বাংলাদেশে একটা শুনানিও হলো না। এতকিছুর পরও যারা বিশ্বাস স্থাপন করেন তাদের বিশ্বাস করার ক্ষমতা দেখে অবাক হতে হয়। মানুষ কথা বলতে পারছে না, ঢাকা শহরে বাতাসে শ্বাসও নিতে পারছে না।

এখন করণীয় একটাই—সেটা হলো যে জনগণ এই অনিয়মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা। তা না হলে শ্রমজীবী মানুষতো তাদের খাবারের প্রয়োজন এই কথাটাই বলতে পারবে না। বছরে ৭ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে, সেখানে কি আওয়ামী লীগের মানুষ নাই। বিধ্বংসী উন্নয়নের যে ধারা চলছে তাতে তো আওয়ামী লীগেরও সকল সদস্য লাভবান হবে না। আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যেও অনেক প্রশ্ন আছে। পুলিশ ও সরকার দলীয় লোকজনের অত্যাচারের কারণে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে প্রতিবাদের জায়গা নেই সেটা ভাবার কোন কারণ নাই। বাংলাদেশে অনেক ধরনের শাসক এসেছে কিন্তু জনগণের লড়াই থামেনি। এটাই আমাদের ভরসার জায়গা। মন্ত্রী-এমপিরা যে রকম অনুগত দেশের মানুষ সে রকম অনুগত হয়ে যাবে সেরকম ভাবারও কোন কারণ নাই। ফলে অব্যাহতভাবে কথা বলা, অনিয়মগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে। কথা বলার জায়গা তিনটা। একটা হচ্ছে গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে, আরেকটা হচ্ছে পরিবেশের জায়গা ও আরেকটা শিক্ষার্থীসহ তরুণদের মধ্যে। এর বাইরেও সংখ্যালঘু, নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যেই জনভিত্তি গড়ে তুলতে হবে, শ্রেণি-পেশার মানুষকে যুক্ত করতে হবে। আন্দোলনের কোথায় ঘাটতি ছিলো, নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি কীভাবে দূর করা যায়, সক্রিয়তা কীভাবে বাড়ানো যায় এগুলোই জায়গা। তা হলেই শক্তিবৃদ্ধি করে সফলতা পাওয়া যাবে। ডাকসুসহ অন্যান্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে কথা বলার জায়গা আছে।

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, দেশের আইনে এটা আছে ওটা বলার মধ্যদিয়ে আমরা সরকারকেই পরো ।ছর্ষায় য়দে র্নথক্ষভাবে সম —রাজনীতিকরা যখন বলেন আইন নাই বিচার নাইআমরা উরে বিরোদল্টাটা বলে আপনাধিতাই করি। আমরা পেশাগত কারণেই আইনি ব্যবস্থাকে তুলে ধরবো। যেমন, ৩০ তারিখে একটা নির্বাচন হলো; নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়া, সেটা ছিলো আইন সম্মত। একজন রির্টানিং অফিসার যখন ভোটের ফলাফল ঘোষণা করছেন তিনি আইন মেনেই তা করছেন। তিনি মিথ্যা তথ্য দিলেন না সত্য তথ্য দিলেন সেটা অন্য ব্যাপার, তার ঘোষণাটা আইন অনুযায়ী হয়েছে। সেটাকে বেআইনি বলতে হলেও আমাকে একটা আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বলতে হবে। অর্থাৎ আমাদের বিদ্যমান আইনি ব্যবস্থাটা বলবৎ রেখে আমাদের অধিকার আদায় ও লড়াই করাটা দুষ্কর হয়ে ওঠেছে। এখানে যে আইন আছে সেটা বলবৎ রেখেই শোষণ-নিপীড়ন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব।

আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটা আইনি সুরক্ষা পেতে চেয়েছি, সেটা পেয়েছি কিনা তা আপনারা জানেন। এবারের নির্বাচনে একটা বড় ধরনের সুনিপুণ কৌশল ছিল। যেমন, নির্বাচনের দিন উল্লেখযোগ্য তেমন বড় ধরনের সহিংসতা ছিলো না। নির্বাচনের আগে যা হয়েছে; পোস্টার, লিফলেট ছিড়ে ফেলা, প্রার্থীকেও মারধর করা, মাইক প্রচারে বাধা দেয়া হয়েছে। নির্বাচনের দিন দেখানোর চেষ্টা ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ, মানুষ লাইন ধরে আছে ভোট দেয়ার জন্য। সব জায়গায় একটা উৎসবমুখর পরিবেশ। কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা ভয়-আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছে এবং সেটা পেরেছে। তারা দেখাতে চেয়েছে যে কেউ কিছু করতে পারবে না, বলতে পারবে না। তাতে তারা সফল হয়েছে। আতঙ্ক ছিল কথা বলে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবে কিনা বা বাড়িতে থাকতে পারবে কিনা? গত এক মাসে দেখেছি ভয়ে কেউ সাহস করে কিছু বলছে না এবং এটা সংক্রমিত হচ্ছে। আমাদের কথা বলার জায়গাটা তৈরি করতে হবে, সাহস দেখাতে হবে।